স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্প (নির্বাচিত) : আধুনিক প্রযুক্তি

শর্মিষ্ঠা জোদার ^{1*}

^{1*} সহ অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

আমরা প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রযুক্তি জীবনে এনেছে স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবাদ। প্রযুক্তি কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষের জীবন সহজ করতে ও প্রতিবেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই প্রযুক্তি। ১৯৩০ এর দশক থেকে প্রযুক্তির সীমা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। বর্তমানে প্রযুক্তি শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একবিংশ শতাব্দীতে ‘প্রযুক্তি’ শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়। ইউরোপীয় ‘Technologic’ ও জার্মান ‘Technik’ শব্দ দুটির অর্থ ভিন্ন। কিন্তু এই দুটি শব্দকেই ইংরাজিতে Technologyতে অনুবাদ করা হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্ত অর্থনীতির ফলে ভারতীয় বাজারে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তি সকলের কাছে সহজলভ্য হয়। বিশ্বায়ন আসলে বাজার দখলের রাজনীতি। বিশ্বায়ন বস্তুত আন্তর্জাতিক পুঁজির সহযোগিতা বাণিজ্য ও বাজারের পরিসরে। বিশ্বায়ন মূলত বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তোলা। ভারতে বিশ্বায়নকে স্বীকৃতির সূত্রপাত ঘটেছে স্বাধীনতার আমল থেকেই। ১৯৪৮ সালে চল্লিশটি দেশ মিলে GATT (General Agreement On Tariff and Trade) চুক্তি সই করে। যার মাধ্যমে বিশ্বায়নকে স্বীকৃতির সূত্রপাত ঘটে। ১৯৯৪ সালে ১৩৫টি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তিতে সই করে। গড়ে তোলে World Trade Organization। যার কাজ ছিল বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ গড়ে তুলতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি করা। চুক্তিগুলির তদারক করা। ১ ভারতে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওয়ের সময়ে (১৯৯১-১৯৯৬)। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এই কাজটি করেন। ফলে ভারতীয় বাজারে দেশী বিদেশী কোম্পানিগুলির অবাধ প্রবেশ ঘটে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ও মহার্ঘ্য ভোগ্যপণ্যদ্রব্য সহজলভ্য হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত এবং ধীরে ধীরে নিম্নবিত্তের নাগালে আসে আধুনিক প্রযুক্তি। সর্বস্তরে প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারণ সমাজে আনে আমূল পরিবর্তন। মানুষের জীবন ও মননে দেখা দেয় বদল। মানুষ ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে ক্রমশ। নৈতিকবোধের অধঃপতন ঘটে। যা শিল্প সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষের জীবন অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়। কিন্তু মানুষের মন ক্রমশ বিপর্যস্ত হতে থাকে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সৃষ্টি হয় নানা সঙ্কট, জটিলতা। মানুষ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানুষের চাকচিক্যময় জীবনের অন্তরালে থাকা অন্ধকারময় দিকগুলি সঙ্কট, যান্ত্রিকতাকে সমসাময়িক গল্পকারগণ তাঁদের গল্পের বিষয়রূপে উপস্থাপন করলেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী পরিবর্তমান সময়ের (সত্তর দশকের) একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ১৯৫২ সালে উত্তর কলকাতায় দরিদ্র পরিবারে। কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে (১৯৬৯, নন্দন পত্রিকায়)। ১৯৭১ সালে ‘অমৃত’য় তাঁর প্রথম ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর কর্মজগৎ ছিল বৈচিত্র্যময়। যা তাঁকে বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর লেখার রসদ জুগিয়েছে। যন্ত্রসভ্যতায় পরিবর্তমান সময়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তিনি। তিনি প্রচলিত ছক ও বামপন্থী দর্শনের বাইরে ভিন্ন পথে পথ চলা শুরু করেন। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গি, প্রকাশরীতি সবই অভিনব। প্রথম গল্প থেকেই তিনি অভিনব ভঙ্গিতে কাহিনী বয়ন করেছেন। কাহিনীর মায়াজালে পাঠককে জড়িয়ে ফেলেন তিনি। তাঁর গল্পসঙ্কলনগুলি দেখলে বোঝা যায় এক একটা থিমকে অবলম্বন করে গল্পগুলি লেখা। একটা সময়ে তাঁর মনে হয়েছে প্রযুক্তি মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানাচ্ছে। ‘সতর্কতামূলক রূপকথা’ গল্পগ্রন্থে তিনি টেকনোলোজিকে টর্নেডো হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি মনে করেন যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। অথচ সেই যন্ত্রের শাসনদণ্ডটিকে যাদুদণ্ড ভেবে সকলে সম্মোহিত হয়। এই অনুভব থেকেই তিনি রচনা করেছেন ‘হনুমান’, ‘যন্ত্রপাতি’, ‘ঝড়ে কাক মরে’, ‘মোবাইল সোনা’, ‘লজ্জামুঠি’, প্রভৃতি গল্প। যন্ত্রসভ্যতায় নাগরিক মানুষের একাকিত্ব, প্রেম-যন্ত্রণা, অনৈতিকতা এবং পরিবর্তমান সময়ের ছবি বয়ন করেছেন তাঁর ছোটোগল্পে। এখানে ‘হনুমান’, ‘যন্ত্রপাতি’, ‘মোবাইল সোনা’ গল্প তিনটি আধুনিক প্রযুক্তির আলোকে আলোচনা করা হল।

‘হনুমান’(শারদ আজকাল, ১৯৯৩) গল্পে যন্ত্রকে মানুষের অধিক গুরুত্বদান, মানুষের যন্ত্রে পরিণত হওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কদম্ব গুছাইত। আগে সে চোর ছিল। এখন সে স্ট্যাচুপুতুল সাজে। সাগরসঙ্গমের মেলায় সে হনুমান সেজেছে। সে শুনেছে এবার হনুমানের বাজার ভালো। কিন্তু তার কাছে মানুষের ভিড় জমছে না। তেমন পয়সাও হচ্ছে না। মেলায় এবার মেশিন হনুমান, রামসীতা এসেছে। মেশিন হনুমানের কাছে মানুষের ভিড় দেখে কদম্ব। যন্ত্রের কাছে মানুষের ভিড় দেখে কদম্বর এতদিনকার বিশ্বাসের ভিত নড়ে যায়। দীর্ঘকাল চুরির পেশার অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে,

“মানুষ মানুষের সঙ্গে থাকতে চায়। কেউ একজন চোর বলে হাঁক দিলে দশজন মিলেই ছুটে আসে। দশজন মিলে প্যাঁদায়, আবার দশজন মিলেই ঠোঁটের রক্ত মুছিয়ে দেয়, জল খাওয়ায়, হাওয়া করে। কদম্ব কীভাবে জেনেছে বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষ শিকার করেছে মানুষ মানুষে মিলে। চাষবাস করেছে একসাথে। মাইকে একটা গান শুনত খুব মানুষ মানুষের জন্য। কদম্ব যখন হনুমান বা মাকালী হয়ে ঘোরে, লোকে আহা, বেচারা মানুষটা এই ভেবেই তো পয়সা দেয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুদিনের সংসার। তবে কেন মানুষ-হনুমানের চেয়ে কলকজা-ভগবানে বেশি নজর?”^২

কদম্ব মেশিন হনুমানের কাছে লম্বা লাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নানারকম কারসাজি করে সে।

“কদম্ব ওর হনুমানে হিন্দি মেশায়, সিনেমা মেশায়, লক্ষ-বক্ষ মেশায় ও যতটা পারে এ বয়সে। পয়সা পায় কিছু কিন্তু মেশিন হনুমান পায় আরও অনেক বেশি। মানুষ কি আজকাল মেশিনকেই বেশি ভালবাসে?”^৩

মেলায় মেশিন হনুমান, মেশিন রামসীতার প্রতি লোকের বেশী আকর্ষণ দেখে তার এতদিনকার বিশ্বাসে আঘাত লাগে। তার মনে হয় মানুষ মানুষের জন্য নয়, যন্ত্রের জন্যই মানুষ।

কদম্ব দেখেছে আগে চাকদায় জ্যাস্ত ঝুলন হত। সেখানে মানুষ না-নড়া পুতুল সাজত, সবাই পাথরের মূর্তির মত স্থির থাকত। গত ক'বছর ধরে এই মেলায় মেশিনের পুতুল ব্যবহৃত হচ্ছে। গল্পকার কদম্বর ভাবনার মাধ্যমে দেখান একটা সময় মানুষ যন্ত্রকে চালনা করত। কিন্তু এখন যন্ত্র মানুষকে চালিত করছে। কদম্ব ভাবে,

“মানুষকে নকল করে পুতুল হয়েছে। এখন পুতুলকে নকল করছে মানুষ। আবার স্থির পুতুল যখন নড়তে শুরু করল, মানুষ পুতুলও নড়া-পুতুলের মতো নড়ল।”^৪

মানুষ যন্ত্রকে অনুসরণ করতে করতে কখন যে সে নিজে যন্ত্র হয়ে যায় বুঝতেও পারে না। কদম্ব মেশিন রামসীতার সামনে হনুমান সেজে থাকে। রামসীতা ঘাড় ঘোরালে সে জয় শ্রীরাম বলতে থাকে। গল্পের শেষে আমরা দেখি কদম্ব তার নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে। কদম্ব দেখে সামনে তার বউ প্রতিমা, দুই ছেলেকে নিয়ে রামসীতা ও হনুমানকে প্রণাম করছে। প্রতিমাকে সে পোয়াতি অবস্থায় ফেলে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন তার আবার প্রতিমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় সংসার জীবনে। সেই বউকে সামনে পেয়েও সে তার নিজের পরিচয় দিয়ে মনের কথা জানাতে পারে না।

গল্পকারের বর্ণনায়,

“কে যে কীভাবে কখন মেশিন হয়ে যায় কে জানে?”^৫

‘যন্ত্রপাতি’ গল্পটি ‘শারদ বসুমতী’তে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পে মেশিন শুধুমাত্র মেশিন থাকেনি জীবন্ত চরিত্রের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। এখানেও মানুষের চেয়ে যন্ত্রকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটা মিক্সি মেশিন কিভাবে একজন নারীর সতীন হয়ে উঠেছে তা গল্পকার বর্ণনা করেছেন। গল্পটিতে প্রদীপ ও পৃথা স্বামী-স্ত্রী। দুজনের মধ্যে আশ্চর্যরকম সমঝোতা আছে। সংসার, সন্তান পালনের কাজকে তারা দুজনে ভাগ করে নিয়েছে। সপ্তাহে চারদিন পৃথার, আর তিনদিন প্রদীপের সকালের চা বানানোর দায়িত্ব। ছোট্ট সন্তানের রাতে ন্যাপকিন বদলের ক্ষেত্রেও তারা চারদিন-তিনদিনের হিসেব মেনে চলে। এইজন্য তাদের সংসারে কোনো বুট-ঝামেলা নেই। এই ভাগটা প্রদীপ নিজেই করেছিল। সেজন্য সে নিজে বেশ গর্ববোধ করে। মাথা ধরলেই সবসময় পৃথাকে দিয়ে মাথা টেপাতে তার ভালো লাগে না। তাই সে একটা মাথা টেপার মেশিন ভাইব্রেটোর কিনে আনে। প্রদীপের মনে হয়,

“প্লাগে লাগিয়ে দিলেই কাঁপতে থাকে, কাঁপতেই থাকে। একটু চায়ের জল চাপিয়ে আসি, কিংবা গ্যাসটা অফ করে আসি বলে থেমে যায় না। কাঁপতেই থাকে। রেগুলেটার আছে। বাড়ানো যায় কমানো যায়...”^৬

পৃথা জানতে চেয়েছিল কার কাছে তার মাথা টেপানো ভালো লাগে? পৃথার কাছে বেশী ভালো লাগলেও প্রদীপ তা গোপন করে। মেশিনের কাছে ভালো লাগার কথা জানায় সে। কারণ প্রদীপের মনে হয় তাতে মেশিনটার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু পৃথারও যে খারাপ লাগতে পারে, অভিমান হতে পারে সেকথা একবারও প্রদীপের মনে হয় না। যন্ত্র কেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের অজান্তে তারই কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ছবি গল্পকার এখানে তুলে ধরেছেন। মিক্সি মেশিন ছাড়া বাকি যন্ত্রগুলির সঙ্গে পৃথার ভালো

সম্পর্ক। মিক্সি মেশিনের সঙ্গে পৃথার সতীনের সম্পর্ক তৈরি হয়। কোনো এক ছুটির সকালে সে দোসা বানিয়েছিল। দোসাটা খেতে খুব ভালো হয়। প্রদীপের বন্ধু পৃথার খুব প্রশংসা করে। প্রদীপ অবশ্য প্রশংসা করেছিল মিক্সি মেশিনটার। কারণ দোসার জিনিসগুলি সব মিক্সিতে বেটেছিল পৃথা। এই ঘটনা থেকেই মিক্সি মেশিনটার সঙ্গে সতীন সম্পর্ক তৈরির সূত্রপাত ঘটে।

“প্রদীপের বন্ধু বলেছিল দারুণ হাত পৃথার। খুব ভাল হয়েছে। প্রদীপ বলেছিল, হাত নয়, হাত নয় মেশিন, মানে মেশিনে বাটা হয়েছে। প্রদীপ তখন পৃথাকে বলেছিল হাতে বাটলে এতো মিহি হত না, বলো।”^৯

ভালো লসিয় বানানো নিয়েও প্রদীপ পৃথার প্রশংসা করেন। মিক্সি মেশিনটার প্রশংসা করে প্রদীপ। মিক্সি মেশিনটার কাছে এই পরাজয় পৃথা মেনে নিতে পারেনি। আর তাই মিক্সি মেশিনটার সঙ্গে তার সতীনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। প্রদীপ দেখেছে পৃথা সব মেশিনগুলির সঙ্গে কথা বলে। তাদের ভাষা বোঝে পৃথা। মেশিনগুলির সঙ্গে তার অদ্ভুত অদ্ভুত সম্পর্ক। শুধু মিক্সি মেশিনটার সঙ্গে পৃথার সতীনের সম্পর্ক হয়েছে। প্রদীপ দেখেছে পৃথার মিক্সির সঙ্গে কথা বলার ধরণটা অন্য মেশিনদের থেকে আলাদা। প্রদীপ দেখে,

“মিক্সি চালাতে চালাতে পৃথার মাঝে মাঝে কপালে সরু রেখার ভাঁজ পড়ে। ছন্দ হাসির দাগ পড়ে। প্রদীপ লক্ষ করে, আজকাল ঠিক লক্ষ করে। কখনও দেখে দাঁতে চাপা ঠোঁট, কপালের ঘাম, ঘামের অভিমান।”^{১০}

চৈতালি প্রদীপের পুরানো বান্ধবী। চৈতালি তাদের বাড়িতে এলেই পৃথার এমন ছন্দ হাসির রেখা, কপালে ডেউ ও ঘামবিন্দু তৈরি হয়। একসময় মিক্সি মেশিনটা খারাপ হয়ে যায়। প্রদীপ খুব চিন্তিত হয়। সন্তান অসুস্থ হলে যেমন হয় প্রদীপ তেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেশিনটাকে নিয়ে। অথচ পৃথার মধ্যে লক্ষ্য করে ওঁদাসীন্য, নির্বিকারভাব। প্রদীপ আশ্চর্য হয়ে ভাবে মেশিনটা খারাপ হলে পৃথারই ব্যস্ত হওয়ার কথা।

“ওকে পৃথাই স্নান করায়, তেল মাখায়, গ্রিজ মাখায়, পরিষ্কার করে, মোছে। ওর কিছু হলে পৃথারই তো মন খারাপ হবার কথা। তাছাড়া ও তো পৃথার কাজগুলোই করে দেয়।”^{১১}

অন্যান্য মেশিনগুলির সঙ্গে পৃথার খুব ভালো সম্পর্ক। রবিবার অনেকটা সময় তাদের এইসব যন্ত্রগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে কেটে যায়। সেলাই মেশিনে তেল দেওয়া, ফ্রিজের বরফ পরিষ্কার করা, ওয়াশিং মেশিনের ড্রয়ার সাফ করা সবই পৃথা করে। কাজগুলিকে আধুনিকতার লক্ষণ বলেই ভাবে সে। যন্ত্রগুলির সঙ্গে নানারকম সম্পর্কের তন্তু গড়ে ওঠে। এদের সঙ্গে একধরনের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই এদের আদর করে নামকরণ করে।

“পৃথা বলেছিল, এদের না এরকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নামে ডাকতে ইচ্ছে করে না। একটা করে ডাকনাম দিলে কেমন হয়।”^{১২}

অন্যসব যন্ত্রগুলিকে খুব আদরের নাম দেয়। মিক্সি মেশিনটার কোনো নাম দেয় না। নামকরণের প্রসঙ্গে মেশিনটাকে বিকলাঙ্গ বলে বিদ্রূপ করে পৃথা। একটা মেশিনের সঙ্গে এমন করে একজন নারীর সতীনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

যন্ত্রসভ্যতায় পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। সম্পর্কে তৈরি হয় দূরত্ব। মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে যায়। একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতেই বেশি করে যন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে। “মোবাইল সোনা” (২০০৭) গল্পে যন্ত্রকে আঁকড়ে ধরেছে কমলিনী। কমলিনী একজন বৃদ্ধা মা। সে ‘নারীমহিমা’ বৃদ্ধাশ্রমে থাকে। বাবলু তার ছেলে। বাবলু নিজে কোনোদিন মাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে বলেনি। কিন্তু কমলিনী বুঝেছিল এইসংসারে সে এখন বাড়তি বোঝা। তাই সে নিজেই বৃদ্ধাশ্রমে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে মা-ছেলের মধ্যে তৈরি হয়েছে দূরত্ব। সেই দূরত্ব কমাতে ব্যবহৃত হচ্ছে মোবাইল ফোন। বাবলু মাকে একটা মোবাইল ফোন দেয়। সে বলে,

“মা এটা তোমার জন্য এনেছি। আর নীচে নেমে আমার ফোন ধরতে হবে না, ফোনটা তোমার কাছেই থাকবে। মানে তোমার কাছেই থাকব আমি।”^{২১}

সত্যিই ফোনটা আর শুধু যন্ত্র হয়ে থাকেনি। সে বৃদ্ধা মায়ের কাছে ছোট্ট সন্তানের প্রতিক্রম হয়ে উঠেছে। যে ফোনে ছেলের কথা শোনা যায়, মা-ছেলের ব্যবধান ঘুচে যায় সেই ফোনটি হয়ে ওঠে কমলিনীর ছোট্ট বাবলু। এটিকে আঁকড়েই তার অবদমিত অপত্যস্নেহ প্রকাশ পায়। ছেলের প্রতিক্রম ভেবে পরম মমতায় কমলিনী ফোনটিকে আদর করে, আগলে রাখে। ঠিক যেমন ছোট্ট বাবলুকে করত। লেখক নিপুণভাবে মায়ের মনোভাব তুলে ধরেন আমাদের সামনে।

“আজ কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে। আনন্দ, ঘুম আসছে না। আজ কতবার বাবলু এল। এখন বাবলু পাশে। বালিশের পাশে। বাবলুটা। বাবলু সোনা। ঘুমু কর। ঘুমু ঘুমু কর। মোবাইল ফোনটার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকেন কমলিনী। ...
কমলিনীর মনে হয় বাবলুর শীত করছে। ছোট্ট মুবু মুবু ফোনটাকে লেপের ভেতরে ঢুকিয়ে নেন। তারপর মনে হল লেপের ভেতরে ওর কষ্ট হচ্ছে। এই ছোট্ট সোনা মনাতার গায়ে এত মোটা লেপ ঠিক নয়। বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালান কমলিনী। ... নাড়ুগোপালের ছোট ছোট সাটিনের চাদর আছে। তারই একটা চাদর ভাঁজ করে মোবাইল সোনাটাকে ঢেকে দেন।”^{২২}

বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প আমাদের শেকড় খোঁজার কোদাল। আলোচ্য গল্পগুলিতে স্বপ্নময় সেই শেকড়ের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যক্তি সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে। মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের দাসে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নময় আধুনিক প্রযুক্তিযুগের সুফল ও তার ভয়াবহ দিকগুলি নিপুণতায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে। যা পাঠককে অভিভূত বিস্মিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। রায়চৌধুরী, মলয়/বিশ্বায়ন ও পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি, পদক্ষেপ, বঙ্গসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন/ডিসেম্বর, ২০০৩/পৃঃ ৪৫
- ২। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়/ হনুমান, শ্রেষ্ঠ গল্প/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩/ পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৭/পৃঃ ১৩৫
- ৩। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১৩২
- ৪। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১৩৭
- ৫। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১৩৯

- ৬। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়/ যন্ত্রপাতি, পঞ্চগশটি গল্প/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯/ চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪/পৃঃ ১১৪
- ৭। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১১৪
- ৮। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১১৪
- ৯। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১১৫
- ১০। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ১১৯
- ১১। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়/ মোবাইল সোনা, পঞ্চগশটি গল্প/আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯/ চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪ /পৃঃ ২২
- ১২। প্রাগুক্ত/ পৃঃ ২৩